তেলেঙ্গানা আন্দোলন : ফিরে দেখা
১৯৪৬-৫১

তেলেঙ্গানা আন্দোলন

ফিরে দেখা

১৯৪৬-৫১

পার্থ প্রতিম দুবে

পুনশ্চ

TELANGANA ANDOLONE
FIRE DEKHA:1946-51
A Book on Telangana movement
By Partha Pratim Dube

First Published
October, 2025

ISBN 978-81-7332-417-8

Price
₹ 575

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০২৫

দাম : ₹ ৫৭৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

বাবাকে

যিনি শ্রমজীবী মানুষের
পাশে দাঁড়িয়েছিলেন

কৈফিয়ত

এ লেখাটি সম্ভব হত না যদি প্রদীপ বসু (জুনিয়র) উদ্‌বুদ্ধ করতেন। বাবা কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, তাঁর ধারা বেয়ে সে নৌকোতে আমারও চড়ে বসা। অল্পবিস্তর কাজকর্ম করার ফাঁকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন চাগাড় দিলে তাকে আমল না দিয়ে চলার মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ ও তৃপ্তি অনুভব করা যেত। শ্রেণিবিভ্রান্তি বলে সেসব উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ কম ছিল না। সরকারি কমিউনিস্ট পার্টি করার মধ্যে দম্ভের ব্যাপার যে একেবারে ছিল না তা নয়। বরং বিনয়ের পরাকাষ্ঠার মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশিত হত। অন্যজনে তা বুঝতে পারত, যে ইনি একাধারে বিনয়ী, অথচ আদর্শে দৃঢ়, স্থিত।

পড়াশোনা সেরকম কিছু ছিল না। বিশেষত মার্কসবাদ। দু'একটি লিফলেট, পার্টি চিঠিতেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। অবশ্য নেতাদের বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শোনা হত। তাদের কথাগুলিকেই বিভিন্ন রকমভাবে বমি করে চাপা দেওয়া হত ছোটো ছোটো গ্রুপ মিটিং-এ। নেতাদের কথা বাণী মনে হত। কত জানেন এঁরা। নিজেকে কেমন যেন হালকা লাগত। আদর্শে স্থিত, শ্রেণি সংগ্রামে আস্থাশীল নেতাদের সমীহ করা হত, তাঁদের কথাই বলা হত গ্রুপ সভাতে, মিটিং-এর ফাঁকে ফোকরে। সেসব আলোচনাতেই শেষ হত মিটিংগুলি। মূল বিষয় তখন বহুদূরে। নেতাদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করার মাধ্যমে একটা আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হত। নেতাদের কাছাকাছি পার্টি সদস্যদের দেবতার সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হত। নেতা দেবতা, — ঈশ্বর। অপৌরুষেয়। যাকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। চেলারা উপদেবতা পর্যায়ভুক্ত।

দিন এভাবেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল এক নামি নেতা জি. বি. মিটিংয়ে বলবেন। সেই প্রথম তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু নতুন শব্দ শোনা গেল। 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', 'শ্রেণি সংগ্রাম', 'অর্থনীতি', 'ক্যাপিটাল' এবং আরও বেশ কিছু শব্দ। এগুলি খায় না মাখে, জানা নেই। ভদ্রলোকের ওপর বেশ শ্রদ্ধা জন্মে গেল। জানলাম ভদ্রলোক অধ্যাপক। একবার দেখা করতে হবে, —এ চিন্তা মনে দৃঢ় হতে লাগল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অর্থাৎ একে তাকে ধরে অধ্যাপক নেতার কাছে পৌঁছনো গেল। তিনি কয়েকটি বই পড়তে বললেন। এর আগে আমার ধারণা ছিলে পার্টি করা মানে বিপক্ষকে দুরমুশ করা। মিটিং মিছিল করা ও পোস্টার লাগানো। ধারণা এখন পালটে গেল। সর্বনাশের সেই শুরু।

অধ্যাপক নেতার বলে দেওয়া বই ছাড়াও তখন মার্কসীয় মতবাদের মূল বইগুলো

পড়ার চেষ্টা শুরু হল। বিভিন্ন সেমিনারে যাওয়া আরম্ভ হল। এসবের ফলে মনে বেশ কিছু সংশয় জন্মাল। বইয়ের কথা আর দলের কথা এবং সেই অনুযায়ী দলীয় আচরণের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিস্ফুট হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল এ পার্টি বিপ্লব করবে না। এক নেতাকে সে কথা বলতে, তিনি বললেন যে, বিপ্লব অত সহজ নয়। সবপথ ঘুরে বিপ্লবের পথে, —একথা বলে গেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ। একটু দমে গেলেও মনে হল এ তো শতাব্দীর শতাব্দী পেরিয়ে যাবে। কিন্তু বিপ্লব! অনেক পরে, বহুসন্ধান করেও আহমদ সাহেবের কোনো বইতে এমনতরো বিপক্ষকে গুঁতিয়ে ফেলে দেওয়া শব্দব্রহ্ম পাইনি। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে কত কিছু যে চলে!

এর পরে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র বিষয়টিকে স্বচ্ছতার সঙ্গে বোঝার জন্য। এমনকী আগমার্কা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ চলল। প্রাক্তন হয়ে যাওয়া থেকে বর্তমানে আগুনখেকো বিপ্লবীরাও বাদ যায়নি। অবস্থা তখন, 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে...'।

একদিন বসে আছি প্রাজ্ঞ মার্কসবাদ বিশেষজ্ঞ ও নেতা বনবিহারী চক্রবর্তীর ফ্ল্যাটে। কথাবার্তা শুরু হতে বেশ কিছুক্ষণ পরে বনবিহারীবাবু একটা বই দেখিয়ে বললেন, এ বই দেখেছ, মার্কসবাদের সঙ্গে আরেকটি মতবাদ জুড়ে দিয়ে হাঁসজারু তৈরি করার প্রচেষ্টা। বইটি 'নকশালবাড়ির পূর্বক্ষণ', লেখক প্রদীপ বসু। অধ্যাপক স্কটিশ চার্চ কলেজের। এটি ওঁর পিএইচ. ডি. থিসিস। বনবিহারীবাবু বইটি আমাকে দিতে চাইলে বললাম, কিনে নেব। বই যতই পড়ি ততই লেখকের উপর ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্কসবাদকে এভাবে হেয় করা। না, ভদ্রলোকের ফোন নম্বর জোগাড় করে বেশ কিছু শুনিয়ে দিতে হবে। যোগাযোগ করা হলে উনি স্কটিশ চার্চ কলেজে আসতে বললেন। সুভদ্র, মার্জিত, বিনয়ী। কিন্তু অন্তরে আমার তখন 'দহন জ্বালা'। উনি খাতা নিয়ে একটা স্কেচ করলেন, কতগুলি বই পড়তে বললেন।

অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বিষয়টি বেশ অভিনব বলে মনে হতে লাগল। আলোচনার জন্য বেশ কয়েকজনের কাছে গেলাম। তার মধ্যে শৈবাল মিত্র অন্যতম। তাঁর মনোভাব দেখা গেল প্রদীপ বসুর কাছাকাছি। একটু দমে গেলাম। অন্তর তখন ক্ষতবিক্ষত। একদিন আবার ফোন করতে উনি ওঁর ফ্ল্যাটে আসতে বললেন। গেলাম নাগেরবাজার দমদমে বাসনা হাউসিং কমপ্লেক্সে। উনি সেদিন যা বললেন তার মোদ্দা কথা হল—মার্কসবাদ এক মহান মতবাদ, কিন্তু সেখানেও বেশকিছু বিষয় অবহেলিত থেকে গেছে আধুনিকতা, শ্রেণিসংগ্রাম ও অর্থনীতিবাদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার জন্য, অনেক বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নারী, ধর্ম, ভাষা, জাতি ও প্রান্তিক মানুষ সেভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি মার্কসীয় মতে, এমনকী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সরাসরি প্রস্তাব দিলেন 'মহান তেলেঙ্গানা আন্দোলন' নিয়ে কাজ করার। সেই শুরু।

'কতগুলি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে'— এ বিষয়টি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল। বৈদ্যবাটী ও সিঙ্গুর সংলগ্ন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে তখনও (অর্থাৎ ১৯৯০

সালে) প্রতিক্রিয়াশীলদের রমরমা। ওখানে মহিলাদের সংগঠিত করতে গিয়ে দেখলাম, মহিলারা সরব এক মদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। তাদের ঘটিবাটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাড়ির পুরুষদের মদের টানে। 'তুলে দেওয়া হবে মদ ব্যবসায়ীকে'— এ প্রতিশ্রুতিতে কাজ হল। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনে পার্টি জিতে গেল। কিন্তু মদ ব্যবসায়ীকে আর তোলা গেল না, কারণ মদ ব্যবসায়ীরা বড়ো পরিবার ও দলীয় ঘনিষ্ঠ। সমর্থক। দল আমাকে বিষয়টি নিয়ে খোঁচাখুচি করতে বারণ করলে আমি দমে গেলাম। হতোদ্যমও। নারীরা আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সংগঠনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওই সমস্ত নারীদের কাছে নিজেকে মিথ্যাবাদী ও হেয় মনে হতে লাগল। এতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে— নারীরা হেলাফেলার বিষয় নয়। দল অবশ্য এতে গুরুত্ব দেয়নি।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল ধর্ম নিয়ে। উপরোক্ত অঞ্চলে এক ভদ্রমহিলার ওপর কালীঠাকুরের 'ভর' হয়। তখন ছাত্র ও যুব সংগঠন ওই অঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছে। 'ভর' হওয়ার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলের ছাত্র-যুবরা এককাট্টা। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হল। মিটিং, সভার পাশাপাশি যুক্তিবাদী সংগঠনকে এনে বেশ কিছু ইন্দ্রজালিক প্রদর্শন হল। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি মঞ্চ তৈরি হয়ে গেল ছাত্র-যুবদের উৎসাহের প্রাবল্যে। এরপর দেখা গেল যুব এক নেতার পেটে ব্যথা উপশম করার জন্য তার মা ওই 'ভর' হওয়া ভদ্রমহিলার কাছে নিয়ে গেছেন। ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে 'ভর' হওয়া কালীঠাকুর যুবকটির চিকিৎসা করলেন। পরে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর ছিল, 'মায়ের জন্য যেতে হয়েছে'। পরবর্তীকালে অনেক মার্কসবাদী নেতার বাড়িতে তুলসী গাছ, মনসা গাছ দেখেছি পুজো হতে। জিজ্ঞেস করলে তাঁর সদাপ্রস্তুত উত্তর ছিল, তোর বউদির জন্য এসব করতে হচ্ছে। একজন বড়ো মাপের নেতার নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার সময় দেখেছি ঝাঁটা-জুতো টাঙিয়ে রাখতে, যাতে বাড়ির ওপর কোনো নজর না পড়ে। জিজ্ঞেস করলে বউয়ের ঘাড়ে দোষ দিয়েছে। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি ভারতবর্ষে ধর্মের প্রভাব প্রতিটি মানুষের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। ইউরোপীয় দর্শন দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে বোঝা যায় না, বিচার তো দূর অস্ত।

আগুনখেকো বিপ্লবী প্রেম করেছেন দলেরই সমর্থক মহিলাকে। দু'জনের ধর্ম আলাদা। ধর্ম বলতে লৌকিক ধর্ম। বিয়ে করার সময় বিপ্লবী নেতা মেয়েটির ধর্ম পরিবর্তন করে আগে তাঁর ধর্মে নিয়ে এসে তবে বিয়ে করেছেন। নেতাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারিনি কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধাকে প্রশ্ন করলে সদাপ্রস্তুত উত্তর, বউদি তো আপত্তি করেনি। জানি না মহিলা বিপ্লবীকে তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে বলেছিলেন কিনা। 'এ এক অদ্ভুত আঁধার'! ঘোর সাম্যবাদীরই যখন এই রূপ, তখন অন্যে পরে কা কথা।

ভাষার ক্ষেত্রে দেখেছি দক্ষিণ ভারতে হিন্দি ভাষা ব্রাত্য। কিন্তু বিদেশি ইংরেজি ভাষা স্বাগত। বাঙালিদের মধ্যে অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি অবজ্ঞা। আবার উত্তর ভারতে হিন্দি

ভাষার প্রবল প্রতাপ। ওপার বাংলার ভাষার প্রতি এদেশের মানুষের তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব। অনেকে ওই ভাষাকে নকল করে কথা বলে। এমনকী মাতুলালয় ওপার বাংলায় হলেও, সে ভাষাকে নকল করে ব্যঙ্গ করতেন স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত। আদিবাসী ভাষাকে খুব একটা কলকে দেয় না, বরং বিদ্রূপ করে অনেক শিক্ষিত মানুষ। অথচ ইউরোপীয়ান ভাষার প্রতি এদেশীয়দের আকর্ষণ দুর্নিবার। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছে। শহিদ হয়েছেন বহু মানুষ। ভাষার জন্য এরকম আন্দোলন ও আত্মত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বিষয়টি বড়ো গোলমেলে। সংজ্ঞা নিরূপণও বেশ বিভ্রান্তিকর। অনেকে মনে করেন পরোৎকর্ষের সাধনাই সংস্কৃতি। অনেকে আবার বহু বিবিধ সাধনার সমাহার বলে মনে করেন। তবে আপাতভাবে বেশিরভাগ মানুষজন মনে করেন সংস্কৃতি মানে হল, সুভদ্র ভাষা, সদাচরণ, শিষ্টাচার ইত্যাদি। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সংস্কৃতি বিস্তৃতি বিষয়, জীবনযাত্রার সঙ্গে যা ঘনসন্ধিবদ্ধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন চৌষট্টি কলার— যা আত্মসংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বলা যেতে পারে সংস্কৃতি হল মনুষ্যত্বের সকল দিকের সুসমঞ্জস্য বিকাশ, এক সংগতিসম্পন্ন পূর্ণতার রূপ। তেলেঙ্গানা আন্দোলন চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। আন্দোলন কখনও পিছিয়েছে, কখনও এগিয়েছে। আন্দোলন থেকে সৃষ্ট মানুষের সংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেও এগিয়েছে, পিছিয়েছে। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি থেমে থাকেনি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই চিরসুন্দর ভাষ্যের থেকে ধার করে বলা যেতে পারে, 'চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই হল স্বাদু ফল, দেখো ওই সূর্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো'। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কর্মীর ও সংগঠকদের মধ্যে দেখা গেছে সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্যের 'চরৈবতি' রূপ।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের আকর বই হল পি. সুন্দরাইয়ার লেখা বইটি, প্রথম সংস্করণ ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত বইটি আমাকে উপহার দেন শিক্ষক দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। বইটি সর্বক্ষণের জন্য দরকার ছিল এ বই লেখার জন্য। আমি দিলীপবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। রবিনারায়ণ রেড্ডির বইটিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র মহাসভার ইতিহাস, তার বিকাশ ও পরিণতি বইটির ছত্রে ছত্রে বিধৃত। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের উপর শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ব্যারি পেভিয়ারের। রণজিৎ গুহের তত্ত্বাবধানের ছাপ বইটির মধ্যে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন এ বই লেখার সময় রণজিৎবাবু গ্রামশির তত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন। বইটির মধ্যে সে পরিচয় মেলে। পরবর্তীকালে তেলেঙ্গানা, আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের কথা আমরা দেখতে পাই, 'উই ওয়ার মেকিং হিস্ট্রি' ও 'দ্যাট ম্যাজিক টাইম' লেখাদুটিতে। মিনু মাসানির ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর লেখা পুস্তকটি কমিউনিস্ট না হয়েও পুস্তকটি সযত্নে তথ্য সহকারে উপস্থাপিত করেছেন। মিনু মাসানি সোশ্যালিস্ট পার্টির সমর্থক। এতে বোঝা যায়, সে সময়ে যাঁরা রাজনীতি করতে আসতেন, তাঁরা

বিভিন্ন দলের সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তথ্যে ও তত্ত্বে। বইটির প্রতিটি পাতায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও আর কিছু বই আছে সেগুলি সবই ইংরেজিতে। বাংলা ভাষায় এক সুপ্রকাশ রায়ের ক্ষুদ্রাকার বইটি ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

তেলেঙ্গানা আন্দোলন নিয়ে লেখালেখির আগে একটি আতঙ্ক হৃদয়ে বাসা বেঁধে ছিল। তেলেঙ্গানা ও তেভাগার মতো আন্দোলন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের গর্বের শেষ নেই। সেটাই স্বাভাবিক। কত মানুষের প্রাণ এর সঙ্গে জড়িত। সাড়ে চার হাজারের মতো গ্রাম মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। এমন মহান আন্দোলনের কথা নিয়ে তার উত্তরসূরিদের গর্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার ভীতি এ সব নিয়ে নয়। ভীতি প্রখ্যাত মার্কসবাদী গবেষক ও ঐতিহাসিকের এক সর্তকবাণী নিয়ে। তাঁর বহুপঠিত বই 'কাকে বলে উত্তরাধুনিকতা'য় নিম্নবর্গীয় পণ্ডিতদের প্রতি নরহরি কবিরাজের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান আমার মনেও ঝড়ের আশঙ্কা নিয়ে এল। সেখানে তিনি লিখেছেন দ্ব্যর্থহীনভাবে, 'যখন নিম্নবর্গীয় পণ্ডিতগণ সাঁওতাল বিদ্রোহ, বীরসা বিদ্রোহের মতো রাজনীতিপূর্ব কৃষক অভ্যুত্থান নিয়ে আহ্লাদিত, তখন তেভাগা, তেলেঙ্গানার মতো সচেতন কৃষকবিদ্রোহ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো উৎসাহ চোখে পড়ে না। কারণ সম্ভবত এসব আন্দোলন বাইরের (মার্কসবাদ) তত্ত্বের সাহায্যে সংঘটিত, এবং তাঁদের মতে যে তত্ত্ব অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন।'

আমার এক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী বললে, 'ছেড়ে দে, বেঁচে যাবি। না হলে বিস্তর গালিগালাজ তোর কপালে নাচছে।'

বন্ধুর কথা শুনে একবার মনে হল, 'যঃ পলায়তি স জীবতি'। ছেড়েই দিই। কিন্তু আশা জাগাল বেশ কয়েকটি বাক্য—যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিখ্যাত 'চরৈবতি' শ্লোক, যা ইন্দ্র রোহিতাশ্বকে পথ চলার প্রেরণার জন্য বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত ছিল, হেরাক্লিটাস-এর বাণী, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিদিন (আকাশে) ওঠে এক নতুন সূর্য।' অর্থাৎ তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিষয়কে নতুনভাবে ভাবা যেতে পারে। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ— যিনি মনে করতেন যে আদতে আমাদের চেতনার রংই পান্নাকে সবুজ করে, সুন্দর দেখায়। এছাড়া বিচিত্রপথেই যে কোনো বিষয়কে ভাবাই যেতে পারে। আর সর্বশেষে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী 'নরসাম্মা'র কথা। যিনি তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সর্বময় কর্তা পি. সুন্দরাইয়াকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন এই প্রশ্ন তুলে, 'শত্রুদের উপর সত্যিকার গেরিলা হামলাতে মেয়েদের অংশ নিতে কেন দেন না আপনারা?' গরিব কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা বছর কুড়ি বয়সের এক কর্মীর এ প্রশ্ন আমাকে উৎসাহ দিল, প্রেরণা জোগাল নতুন করে ভাবার। শেষ বলে আদৌ কিছু হয় কি! মূল (origin) কি আদৌ শেষকথা বলে? এর বিরুদ্ধে জাক দেরিদা তাঁর প্রথম বিখ্যাত বই 'দি লা গ্রামাটোলজি'তে রুশোর 'মূলের' ধারণায় কুঠারাঘাত করেছেন। খাঁটি ও একমাত্র সত্য বলে বহু কথাই তো কত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ফন্দিফিকিরে ব্যবহৃত হয় তা প্রায় সকলের কাছেই জ্ঞাত। অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বলে

কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব কিনা তা এখন বিচার্য বিষয়। আসলে একের অন্তরেই লুকিয়ে থাকে বহুত্বের রসদ। বিচিত্রপথের সন্ধান। বুকে বল এল। এবার কোমর বেঁধে নেমে পরা যেতে পারে। সামনে পি. সুন্দরাইয়ার বিখ্যাত বই তেলেঙ্গানা আন্দোলন নিয়ে।

পি. সুন্দরাইয়া প্রসঙ্গে একটি কথা স্মতর্ব্য, তা হল সততা। তিনি যা ঠিক মনে করেছেন তা লিখেছেন। একটু বিষয়ান্তরে হলেও এর একটি উদাহরণ পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিষয়টি হল ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি যা অনেক কমিউনিস্ট নেতাই বলেন না, স্বীকারও করেন না। বক্তব্যটি ছিল, '... ক্ষমতার প্রকৃত হস্তান্তরের মাধ্যমে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি ব্রিটিশরা নাকচ করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাদের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছিল আমাদের তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া উচিত ছিল। ... মনে হয় আমাদের পার্টির অতিরঞ্জিত এক আশঙ্কা ছিল যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ওই ধরনের কোনো সংগ্রাম সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রস্তুতিকে দুর্বল করবে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে তাদের জয়লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

পার্টি ব্রিটিশের কাছ থেকে জাতীয় সরকারের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস-লিগ আঁতাতের পক্ষে ওকালতি করেছিল। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্বেগ থেকে পার্টি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বের ভুল প্রয়োগ করে এবং মত প্রকাশ করে যে মুসলিম লিগের পাকিস্তান গঠনের দাবি যুক্তিসঙ্গত। তারা এই যুক্তি উত্থাপন করে যে কেবলমাত্র ওই অধিকার স্বীকৃত হলেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের অধীনস্থ হবার যে আশঙ্কা মুসলিমদের মধ্যে আছে তা দূরীভূত হবে এবং ভারতের ঐক্য রক্ষা ও তা সুসংহত করা সম্ভব হবে।

পৃথক পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে মুসলিম লিগ নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি বুঝে উঠতে পারেনি। মুসলিম লিগ যে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করে বাস্তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খেলাই খেলছে, তাও পার্টি বুঝতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা এবং শ্রমিক, কৃষক ও ভারতের অন্য স্তরের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে লিগ ও কংগ্রেসের পিছনে যে বিরাট জনগণ রয়েছে তাদের একত্রিত করার কাজে মনোনিবেশ না করে পার্টি শুধুমাত্র কংগ্রেস ও লিগের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ঐক্যের পক্ষে স্লোগান তোলে।'

অলমিতি বিস্তারেণ। আরও এরকম বেশ কিছু মূল্যবান মূল্যায়ন পুস্তকটির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যেতে সি পি আই ভেঙে যখন সি পি আই এম গঠিত হয় তখন তার প্রথম সম্পাদক হন পি. সুন্দরাইয়া। পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতার কারণে সম্পাদকের পদ অবহেলায় ত্যাগ করে অন্ধ্রপ্রদেশের জেলা কমিটিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছিল এক চমকপ্রদ ও বিরল দৃষ্টান্ত। দেহত্যাগ

না করলে পদত্যাগ করা যায় না,— কমিউনিস্ট পার্টিতে সে সময় এমন চল স্বাভাবিক ছিল। পি. সুন্দরাইয়া এমন ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন।

বইটি লেখার তাগিদ ও প্রেরণা পাই আমার পিতা প্রয়াত সুনীলকুমার দুবের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। যিনি আজীবন মানুষের সংগ্রামের পাশে ছিলেন। তিনি তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতনের প্রধানশিক্ষক ছিলেন ও অল্প বয়সেই প্রাণ হারান। প্রকৃতি দুবে আমার মা। তাঁকে দেখেছি সন্ত্রাসের সময় আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের দ্রুত রান্না করে খাওয়াতে। বাবার জন্য মায়ের চিরকালীন আত্মত্যাগ। নারীদের প্রসঙ্গে তাঁর কথাই সবচেয়ে মনে পড়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাকে খাইয়ে দাইয়ে স্নেহচ্ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিলেন আমার মাসিমণি প্রভাবতী দেবী। তিনি বিয়ে করেননি, মানুষের জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবশ্য জাতীয়তাবাদী। তিনি প্রয়াতা। কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে তিনি চলে গেছেন। আমার স্ত্রী নীতি দুবে সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন বলেই, এ বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমার কন্যা বিদূষী দুবেও মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। আমি দু'জনের কাছেই কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক সঞ্জীব দাস ঐকান্তিকভাবে চেয়েছিলেন বইটি প্রকাশিত হোক। তিনি আমার সুহৃদ ও ভ্রাতৃবরেষু। তিনিই আমাকে 'পুনশ্চ'র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সন্দীপবাবু বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক সঞ্জীব দাসের প্রতি আমার ভালোবাসা সততই ফল্গুধারার মতো প্রবহমাণ। বাড়তি কৃতজ্ঞতা তাঁকে আর জানালাম না। প্রুফ সংশোধনের গুরুদায়িত্ব হাসির মল্লিক নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদশিল্পী-এর কাছেও কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞতা জানাই পুনশ্চর ডিটিপির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের। বইটি পড়ে যদি কোনো পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের জন্ম নেয়, তবে বইটি সার্থকতার পথে কিছুটা এগিয়ে যাবে বলে, আমি মনে করি। সব ধরনের আলোচনা সমালোচনা হোক বইটিকে নিয়ে এ আমার ইচ্ছা। বিশেষত কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এনিয়ে যদি ভাবেন, তাহলে ভালো লাগবে।

বইটির দোষত্রুটি আমার।

শ্রীরামপুর, হুগলি

পার্থ প্রতিম দুবে

সূচিপত্র

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পটভূমি **১৭-৫৮**

- ভাষার কথা ১৭
- ধর্ম এবং তার প্রভাব ১৯
- নিজামের শোষণচিত্র ২১
- কুপ্রথার কথা ২৩
- তেলেঙ্গানার অর্থনীতি ২৬
- তেলেঙ্গানায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : পূর্বকথা ২৯
- নিজামের রাজত্বে শ্রমিকশ্রেণির কথা ৪১

টীকা ৪৫

সূত্রনির্দেশ ৫৬

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে জতিগত প্রভাব **৫৯-১১০**

- তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময় জাতি ও উপজাতিদের ভাগসমূহ ৬১
- জনজাতির বিশ্লেষণ ৬৬
- জাতিগুলির সাংস্কৃতিক চৈতন্য ৭৭
- আদিবাসী সমাজে সংস্কৃতায়ন ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন ৮০
- জাতিসমস্যার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা ৮৩
- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে মার্কসবাদী ধারণায় জাতিগত সম্পর্ক ৮৭
- সিদ্ধান্ত ৯৭

টীকা ৯৯

সূত্রনির্দেশ ১০৬

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের জন্ম : ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব **১১১-২০০**

- প্রাক্‌কথন ১১১
- অন্ধ্র মহাসভা ১১২
- জন্মলগ্নে সাংস্কৃতিক চেতনা ১১৪
- অন্ধ্র মহাসভার সম্মেলনগুলির কথা ১১৬
- অন্ধ্র মহাসভায় ভাষার প্রভাব ১২৭
- অন্ধ্র মহাসভা ও নয়া সামাজিক আন্দোলন ১৩০

- সংস্কৃতি ও তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ : কথারম্ভ ১৩২
- কমিউনিস্ট পার্টি ও সংস্কৃতি ১৩৫
- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে সংস্কৃতির প্রভাব ১৪২
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি ১৫২
- অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ১৬১
- বোঝার তাগিদ ১৬৩
- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে সংস্কৃতি ও নয়া সামাজিক আন্দোলন ১৬৭

টীকা ১৭১

সূত্রনির্দেশ ১৯৪

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারী ও ধর্মের প্রভাব ২০১-৩২৪

- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীর কথা ২০১
- ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান ২০২
- মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি আন্দোলন ২০৫
- মার্কসবাদে নারীদের কথা ২০৬
- তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে নারীসত্তার প্রাধান্য ও বিকাশ ২১৩
- কমিউনিস্ট পার্টিতে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব ২১৫
- নারীসত্তার অবমাননা ২১৬
- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারী আন্দোলনকারীদের সমস্যার কথা ২২২
- স্বপ্নভঙ্গ কখন হল ? ২৩০
- সিদ্ধান্ত ২৩৪
- তেলেঙ্গানা আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব ২৩৯
- ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের অভিমত ২৪২
- কৃষক আন্দোলনে ধর্মের রূপ ২৪৪
- আদিবাসী সমাজে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রভাব ও ধর্ম ২৪৭
- ধর্মীয় উত্তেজনা ২৫৭
- ধর্ম ও নয়া সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ২৬৬

টীকা ২৭৯

সূত্রনির্দেশ ৩১৭

উপসংহার ৩২৫

টীকা ৩৪৯

আলোকচিত্র ৩৬১

তৎকালীন সংবাদপত্রে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের খবরাখবর ৩৬৯

নির্দেশিকা ৩৭৭

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পটভূমি

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কথা আরম্ভ করার আগে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কথা বলে নেওয়া উচিত। কারণ হায়দ্রাবাদ রাজ্য এবং তার অধিবাসীদের নিয়েই তো তেলেঙ্গানা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

১৭২০ সাল নাগাদ হায়দ্রাবাদ রাজ্য নিজামের শাসনাধীন হয়। মোগল শাসনের শেষভাগে, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মীর কামারুদ্দিন আসফ খাঁ গোটা দক্ষিণ ভারতের সুবেদার নিযুক্ত হন। মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হওয়া মাত্র আসফ খাঁ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন (খাঁ. কাফি, *তেলেঙ্গানা বিপ্লব*, ১৯৯৬, পৃ. ১৪)। এরপর ইংরেজরা ক্ষমতায় এলেও আসফের উত্তরসূরিরা তাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থেকে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দোস্তির সূত্রপাত সেই ১৭৪৯ সাল থেকে।

নিজাম মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর রাজত্বে শিক্ষিত মুসলিমদের রমরমা ছিল। এর ফলে যা হওয়ার তাই হয়। কিছু মানুষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, আর বেশির ভাগ মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে ভোগে। বেকারি ও দারিদ্রতা তখন নিত্যসঙ্গী রাজ্যের। নিজামদের অবশ্যই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কারণ তাঁরা তাঁদের রাজ্যের ইসলামিকরণ নিয়ে আত্মরতিতে মগ্ন (*টীকা*-১)।

সারা বিশ্বজুড়ে ইসলামি দুনিয়ার পতন নিয়ে নিজাম বেশ চিন্তিত ছিলেন, যদিও গর্বিত বোধ করতেন হায়দ্রাবাদ রাজ্য নিয়ে। কেননা সেখানেই একমাত্র ইসলামি রাজত্ব নির্বিঘ্নে চলেছে। এই রাজত্বকে তিনি 'আল্লাহ'র দান বলেই বর্ণনা করেন। মুসলিম সমাজকে খুশি করার যাবতীয় মাধ্যম তিনি ব্যবহার করতেন এবং এর ফলে মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কিন্তু এসব করার সময় তিনি খেয়াল রাখেন না যে তিনি যাঁদের নিয়ে রাজ্যপাট চালাচ্ছেন তাঁদের বেশির ভাগ অংশই অমুসলমান। তাঁদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি অনেকাংশে আলাদা।

● ভাষার কথা

নিজামের সময় হায়দ্রাবাদ রাজ্য বহু ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রধানত তিনটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়; তেলেঙ্গানা, মারওয়াড়া ও কর্ণাটক। আটটি তেলেগুভাষী জেলা সহ রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহর ছিল তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর

পশ্চিমে পাঁচটি মারাঠাভাষী জেলা নিয়ে মারওয়াড়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল তিনটি কন্নড়ভাষী জেলা। তেলেঙ্গানার আটটি জেলাতেই হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। জেলাগুলি হল—ওয়ারাঙ্গাল, নালগোন্ডা, মহবুবনগর, হায়দ্রাবাদ, মেদাক, নিজামাবাদ, করিমনগর ও আদিলাবাদ (রায়. সুপ্রকাশ, *মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় কৃষক*, ১৯৮৯, পৃ. ১৪৭)।

তেলেগু বা তেলেঙ্গা জাতীয় মানুষজনের বাস ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পূর্বদিকে। সেজন্যই এ অঞ্চলের নাম হয় তেলেঙ্গানা অঞ্চল। রাজ্যের প্রায় অর্ধেক মানুষের বাস এখানে। বাকি অংশ ছিল মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল ও কর্ণাটক অঞ্চল। আঠাশ শতাংশ জায়গা জুড়ে মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল এবং বাকি বাইশ শতাংশ ছিল কন্নড়ভাষীদের জায়গা। ১৯৫০ সালের আদমশুমারির হিসাব ধরলে তেলেগুভাষী ছিলেন প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ, মারাঠাবাষীর সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ এবং কন্নড়ভাষী ও উর্দুভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে কুড়িও একুশ লক্ষ।

যে একুশ লক্ষ উর্দুভাষীর সংখ্যা বলা হল তারাও বেশির ভাগই বাস করতেন হায়দ্রাবাদ শহর এবং তার আশপাশে। হায়দ্রাবাদ শহর ছাড়া রাজ্যের কোনো অংশেই তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন না। নিজাম ধর্মে মুসলমান, রাজ্যের সর্বময় কর্তা। একুশ লাখের মুখের ভাষা উর্দুকে এক কলমের খোঁচায় করে দিলেন সরকারি ভাষা (ধানাগারে. ডি. এন, পেজ্যান্ট মুভমেন্টস্ ইন *ইন্ডিয়া*, ১৯৯৪, পৃ. ১৮৩)। বারো শতাংশ মানুষের ভাষা চেপে বসল আশি শতাংশ হিন্দু ধর্মের মানুষের ঘাড়ে। (সেন্সাস রিপোর্টস্ ১৯০১-১৯৫১; কুরেশি, এ. আই, দি ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ হায়দ্রাবাদ, ভুল্যম ১,১৯৪৭, পৃ. ৩০-১)।

আদালতে, প্রশাসনে তখন উর্দু ভাষার রমরমা। ফলে উর্দু না জানলে ওই সব জায়গায় কোনো কলকে পাওয়া যেত না। চাকরি বাকরি তো দূরঅস্ত। সেসব ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রেও এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। প্রাথমিক স্তর থেকেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ ভাষা শিখতে হত। এমনকী এ ব্যবস্থা চালু ছিল মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত।

তবে অন্য কিছু পড়া যাবে না এমন নয়। তার জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসকরা এ অনুমতি দিতেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজামের কাছ থেকে অনুমতি লাগত। অনুমতিপত্র পেলে তবেই তেলেগু, কন্নড় ও মারাঠি প্রভৃতি জনসাধারণের মাতৃভাষায় বেসরকারি বিদ্যালয় চালু করা যেত (সুন্দরাইয়া. পি. *তেলেঙ্গানা পিপলস, স্টাগল অ্যান্ড ইটস্ লেসনস্* ১৯৭২, পৃ. ৭-৮)। এমনকী উর্দু ছাড়া অন্য ভাষার গ্রন্থাগার বা সাহিত্য সমিতি শুরু করতেও বিশেষ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হত। এ সবের ফলে শিক্ষার হার বেশ কম ছিল। মাত্র ৬ শতাংশ।

নিজাম এভাবেই হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ইসলামিকরণের পদক্ষেপ হিসাবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবদমিত করার চেষ্টা চলে জনগণের ভাষাগুলিকে। তাদের নিজেদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও তার উন্নতির বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা জন্ম দেয় নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশরূপে (সুন্দরাইয়া. পি, ১৯৭২, পৃ. ৮)।